দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

প্রমা

[২০২২-২৩]

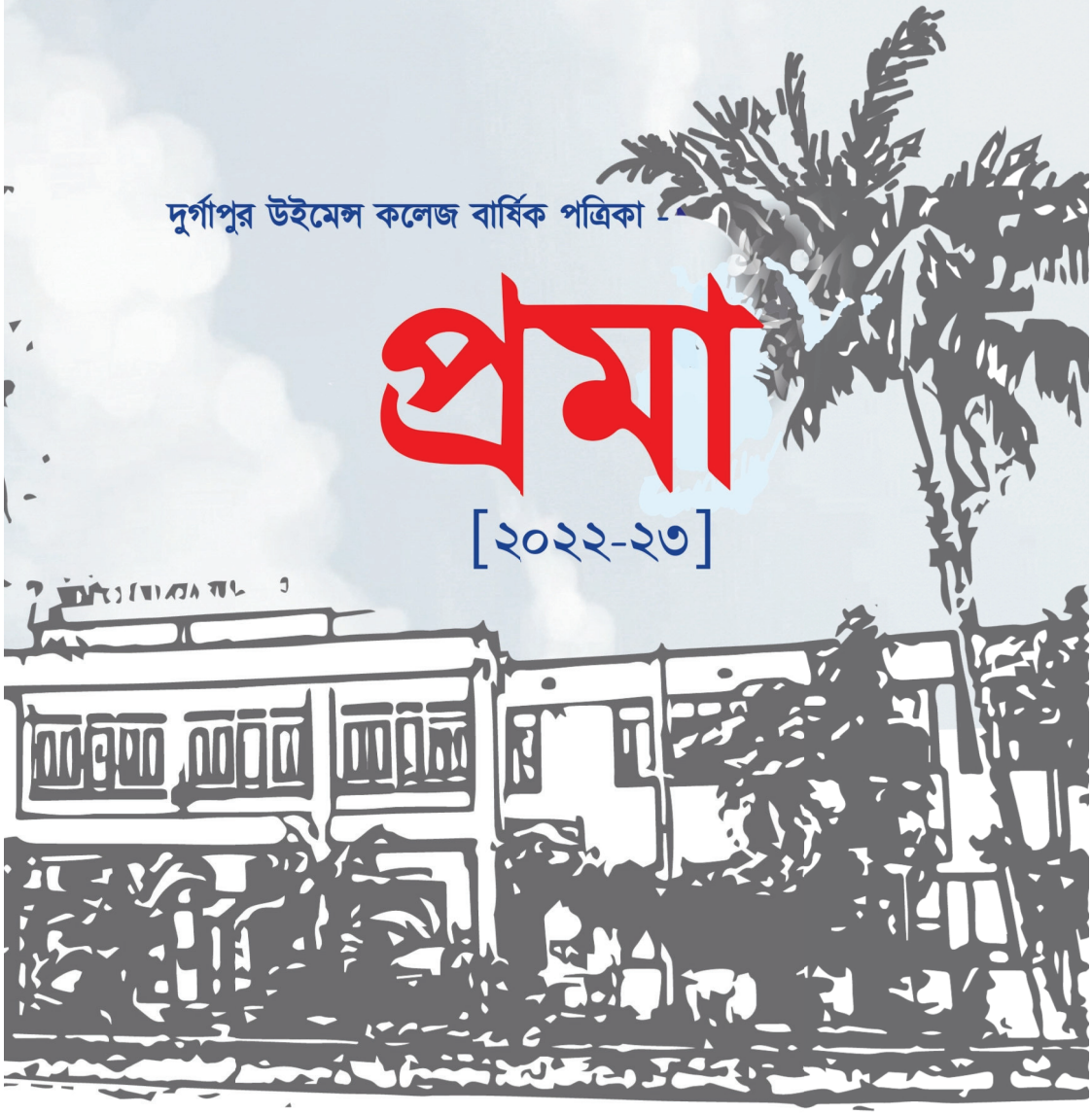

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ বার্ষিক পত্রিকা -

প্রমা

[২০২২-২৩]

আহ্বায়ক: ড. অনুপ কুমার মাজি

বিশেষ সহায়তায়: ড. দেবদীপ ধীবর

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ
দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

PRAMA (Annual Issue)
Durgapur Women's College Magazine - 2023
durgapurwomencollege@gmail.com

প্রকাশ : ২০২৩

© লেখক: পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় লেখাপত্রের বিষয়বস্তু ও তার মৌলিকতার ভার সংশ্লিষ্ট লেখকদের

প্রচ্ছদ
পায়েল বর

প্রকাশক
দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ
দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ৭১৩২০৯

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ সহায়তায়
ধী পাবলিকেশন
জিঞ্জিরা বাজার, ব্রেস ব্রিজ, ১নং পোল,
মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০০৮৮
Mob. +918017956574
e-mail: dhi.publication@gmail.com

কথামুখ....

দুর্গাপুর উইমেনস কলেজের যাত্রা শুরু ১৯৮১ সালের ৫ই এপ্রিল। দুর্গাপুরে এটিই একমাত্র মহিলা কলেজ। মহিলাদের শিক্ষা-প্রসার সামাজিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২১ এর সেন্সাস অনুযায়ী ভারতের গড় শিক্ষার হার ৭৭ শতাংশ, আর মহিলাদের শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ অর্থাৎ জাতীয় গড়ের থেকে কম। মহিলাদের যথার্থ শিক্ষা প্রসারই একটি দেশ ও তার সমাজের অগ্রগতির অন্যতম কারণ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে মহিলাদের শিক্ষার প্রসার ও মহিলাদের সক্ষমতা অর্জনের সহায়ক হওয়ার লক্ষ্যে এই কলেজ এগিয়ে চলেছে। কলাবিভাগ, বানিজ্য বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ-এ তার শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে শহর থেকে গ্রামান্তরের বহু ছাত্রীকে শিক্ষা বিতরণে সক্ষম। তাদের সেই স্বপ্ন আরও বড় হবে এই আশা রাখি।

সেরকম ভাবেই এখানে পাঠ্যক্রমের শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশের জন্য তৈরি হবে 'নান্দনিক' – একটি শিল্পচর্চা কেন্দ্র। মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার জন্য তৈরি হবে 'মহিলা শিক্ষাচর্চা কেন্দ্র'। সমাজ ও শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। সমাজের অবহেলিত মানুষদের সঙ্গে এই কলেজকে যুক্ত করার লক্ষ্যে তৈরি হবে 'দিশা' সেখানে নিকটবর্তী এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদান করে আমাদের কলেজের ছাত্রীরা।

যাঁদের আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমে এই মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেই বহুপরিচিত, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তাঁদের তৈরী করা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। ওঁদের মধ্যে আমি খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ওঁদের নিঃস্বার্থ কর্ম ও আত্মত্যাগ আমার কর্মজীবনের যাত্রাপথে সেই অভিজ্ঞতা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাক। ওদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানালাম। এই শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রীরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করে মনুষ্যত্বের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাক এই আশা করি।

ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল
অধ্যক্ষা
দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

কথামুখ....

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি"

'আমরা' — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

'করোনা' আমাদের মনঃপীড়া, মানসীব্যথা। করোনা অতিমারির পরাক্রম আপাতত স্তিমিত। 'নীল প্লাস্টিকে মোড়া সময়' অতিক্রান্ত। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছিল মেঘনাদ। মায়াবী শক্তি, শুভ শক্তির বিপক্ষে জয়ী হতে পারেনি। মেঘনাদের মতো অদৃশ্য জীবাণু শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশল দেরীতে হলেও একসময় তা মানুষের আয়ত্তাধীন হল। ছন্দে ফিরল পৃথিবী। জয়ী হল মানুষ। সৃজন। সহস্র প্রতিকূলতাতেও জীবন থেমে থাকে না। সে তার স্বাভাবিক ছন্দে চলে। এখনও চলছে। নতুন লেখক লেখিকাদের সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত করার প্রয়াসে আবারও আত্মপ্রকাশ করছে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রমা'। একাধিক কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, ব্যক্তিগত গদ্য, প্রবন্ধ – এরূপ নানান রঙের বর্ণচ্ছটায় পত্রিকাটি হয়ে উঠেছে রঙিন। নবীন লেখক লেখিকাদের সুপ্ত প্রতিভাকে পত্রিকার পাতায় মেলে ধরতে পেরে 'প্রমা' গর্বিত।

মুঠো ফোনের দৌলতে দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় ধরতে চাওয়ার এই অনাবশ্যকীয় আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে সেটা ভালোমতো বোঝা যায় বর্তমান ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার প্রতি অনাগ্রহতা লক্ষ করে। অতিমারি পরবর্তী সময়ে ছাত্রীদের কাছে লেখা চেয়ে একাধিক নোটিশ দেওয়া হলেও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। ছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকায় অংশগ্রহণ কম – এটা নিঃসন্দেহে খারাপ লক্ষণ। আগামীতে এই আগ্রহ কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, আমাদের সকলকে ভাবতে হবে।

এবার ধন্যবাদ জানানোর পালা। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই 'প্রমা'র লেখক-লেখিকাদের, যাদের লেখা না পেলে পত্রিকার অবয়ব তৈরি হতো না। ধন্যবাদ জানাই পত্রিকা কমিটির সকল সদস্য তথা ধী পাবলিকেশনকে, যারা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বর্তমান ছাত্রী, গুণী প্রাক্তনদের মূল্যবান লেখাগুলির নির্বাচন থেকে শুরু করে, প্রুফ সংশোধনসহ পরিমার্জনের একাধিক গুরু দায়িত্ব পালন করে পত্রিকাটির মান বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই কলেজের অধ্যক্ষা, মাননীয়া ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল মহাশয়াকে, যার সুপরামর্শ ও নিরন্তর তাগাদা ও আন্তরিক সহযোগিতায় পত্রিকাটি সুন্দর ভাবে সাজানোর চেষ্টা হল।

ড. অনুপ কুমার মাজি,
পত্রিকা কমিটির আহ্বায়ক ও সম্পাদক

সূচিপত্র

ফিরে আসা কথারা	অঙ্কিতা মন্ডল	৭
'প্‌ধারও মারে্‌ দেশ-অ্‌' (রাজস্থান)	অনন্যা দাস	৮
তোমায় পাবো বলে	অমিত সরকার	১০
উইমেনস্‌ কলেজ	আব্দুল আজিজ উস্‌ সুবহান	১১
পরিবর্তন	ঋদ্ধিমা নায়ক	১২
রুম নম্বর ১৮	জয়িত্রী ঠাকুর	১৩
নারী	ঝিনুক সিংহ	১৫
উড়ে আসা তারা	দেবদীপ ধীবর	১৭
ভাঙাগড়া	পারমিতা মন্ডল	১৮
বৃন্দাবনের মা	পূজা মণ্ডল	১৯
নম: গুরুদেব	প্রতিমা বিশ্বাস	২১
প্রাচীন চীনের নারীর সমাজ	প্রিয়া বাগ্‌দি	২৩
অপ্রাপ্ত ভালোবাসা	প্রিয়াংকা ঘোষ	২৫
যখন ছোটো ছিলাম	মৌটুসী মন্ডল	২৭
এক বিপ্লবী নারীর গল্প	রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়	২৮
এক পায়ের চড়ুই	রানী বাল্মীকি	২৯
ভাষা	রিয়া দে	৩০
মন-পাখি	শতাব্দী মুখার্জী	৩১
মা	সরস্বতী ঘটক	৩২
তরঙ্গিণী	সুচন্দ্রা গরাই	৩৩
ভাঙা-গড়া	সূর্য সরকার	৩৪
চেতনা	স্মৃতিকণা ঘোষ	৩৬

आखिर क्यों	निधि कुमारी	৩৭
नारी	रूपा वर्मा	৩৯
शहर की ओर	पिनाकी सिंह	৪০
आजकल की देशभक्ति	प्रिया कुमारी	৪২
Teacher	K.B.K. SIRISHA	৪৪
My Girl	Saraswati Ghatak	৪৫
Aspiration	Shanghamitra Chandra	৪৬
UNFINISHED	Shreya Das	৪৭
আলপনা	ঋদ্ধিমা নায়ক	৪৮
চীনের নারী	সুলেখা মুর্মু	৪৯
নামহীন	অদ্রিকা কোনার	৫০
CHINESE PRESENT PAINTINGS FOR SALE	পৌলোমী দাস	৫১
প্রাচীন ভারতে 'ভূমিদান': মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান	স্নেহা রায়	৫২

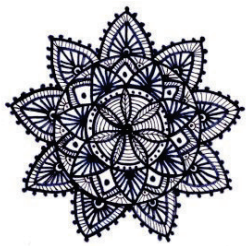

ফিরে আসা কথারা

অঙ্কিতা মন্ডল

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

উঠানের ওই ঝুপসি শিউলি গাছটা থেকে যখন টুপটাপ করে দু-একটা ফুল পড়তে শুরু করে, ক্ষণিকের কালো মেঘ কেটে গিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশটাতে সাদা মেঘগুলো যখন মনের আনন্দে খেলা করে বেড়ায়, তখন সবে সাতে পা দেওয়া মুন্নির মনটা কেমন ভেজা ভেজা হয়ে ওঠে। মিঠি নদীর পাশে নতুন নতুন কাশফুল ফুটে ওঠে আর চারপাশের পরিবেশটা যেন আনন্দে মেতে ওঠে। এমন সময় কাশবন থেকে সদ্য ফোটা কাশের ডাঁটি মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে মুন্নির বাবা বলে, "দেখ্ মুন্নি, চারদিকে কেমন সাজুগুজু চলছে। মা আসছেন যে... আমারও যাবার সময় হয়ে এলো।"

বাবার আঙুল ধরে আলপথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসা মুন্নির মুখটা কেমন করুণ হয়ে ঝুলে পড়ল, জ্ঞান হওয়া থেকে সে দেখে এসেছে সব্বাই যখন পুজোয় মেতে ওঠে সে তখন তার মায়ের সাথে একাই থাকে। বাবা তার ঢাকটা কাঁধে করে কবেই চলে যায় শহরের পুজোয়। বাবাকে ছাড়া একটুও ভালো লাগে না ওর।

-"ও কী হল রে? মুখটা অমন-পানা করলি যে?" বাবা বলে।

-"তুমি চলে গেলে আমার ভালো লাগে না বাবা।"

-"তাই বললে কী হয় রে মা? মা আসছেন যে, বছর ঘুরে, ঢাকের বাদ্যিতে তার মুখে যে হাসি ফোটে!"

-"সে কার মা? ... বাবা?"

-"সবার মা, তাকে যত্ন করে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তবে তো আমার ছুটিরে!"

চুপ করে যায় ছোট্ট মুন্নি, সে তার মনে মনে সব হিসেব মিলিয়ে নেয় আর ভাবতে থাকে...।

"সবার মা" চলে গেলেই তার বাবা ফিরে আসবে।

-0-

‘প্‌ধারও মারে্‌ দেশ-অ্‌’ (রাজস্থান)

অনন্যা দাস

ছাত্রী, ভূগোল বিভাগ

মাসটা ফেব্রুয়ারি। মাধ্যমিক পরীক্ষা সবে শেষ করেছি। জীবনের অর্ধেক চাপ যেন শেষ হলো, মানসিকভাবেও হাল্কা লাগছে। কিন্তু আরও ভালও লাগছে যে এটা ভেবে যে কিছুদিনের মধ্যেই আটকা ঘর থেকে বেরিয়ে এক অন্য রাজ্যে পাড়ি দেব।

“থাকবোনা কো বদ্ধ ঘরে।
দেখবো এবার জগৎটাকে ।।”

- কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ‘সংকল্প’ কবিতার দুই লাইন যেন আপনেই বলে ফেললাম। সত্যিই তো, ভীষণ আনন্দ লাগছে। স্বপ্ন সত্যি হবে যে।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, রাত ৩টে। আসানসোল থেকে ট্রেন রওনা হল, গন্তব্য যোধপুর, রাজস্থান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মত পশ্চিমে যাচ্ছি; এক একটা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে এক একটা শহর পেরোচ্ছি; আর চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও পরিবর্তন হচ্ছে। পরদিন ঠিক ভোর ৪টে, রাজস্থানে প্রবেশ করছি। বুঝতে পারলাম ট্রেনের বাইরের পরিবেশ এবং ট্রেনের কামরায় লোকজনের ভাষা শুনে। মানুষ একই কিন্তু, তাদের খাওয়া-দাওয়া, ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখতে দেখতে সকাল ১১টা, পৌছালাম যোধপুর, Blue City।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে, প্রথমেই চললাম মেহরানগড় ফোর্ট। কী বিশাল সেই দুর্গ! পাথরের তৈরি সুবিশাল ইমারত যেন পুরো যোধপুরকে দেখছে। দুর্গের ভিতরের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র, পোশাক, বাসনপত্র সাজানো। এছাড়াও সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে দুর্গের বারান্দা থেকে গোটা শহরকে দেখা। প্রতিটা মাটির বাড়ি নীল ও সাদা রঙের, অপূর্ব দৃশ্য!

পরদিন সকালে উঠে, রওনা হলাম উমেদ ভবনের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে সোজা জয়সলমীর। আবারও প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন বাড়িঘরের পর্ব শেষ, চারিদিকে শুধু বালি, মাঝেমধ্যে দুএকটা গাছ ও গবাদি পশু। প্রথমেই দেখলাম থর মিউজিয়াম, মরুভূমির মাঝে এক মিউজিয়াম, স্পেশালি CRPF Camp-এর মিউজিয়াম। সেখানেই বানজারা নাচ ও উট সাফারি। পরদিন সকালে সেখানকারই মহাবীর মন্দির, পটওয়ান কি হাভেলি ও বিখ্যাত সোনার কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাজস্থানের আসল ঐতিহ্য ও রাজকীয়তা বহন করছে এই শহর।

পরবর্তী স্থান মাউন্ট আবু। সকালের অত্যন্ত গরম ও রাতের কাঁপানো ঠাণ্ডা, এখানকার পরিবেশকে অত্যন্ত চরম করেছে। মরুভূমির বালি ছেড়ে এবার শীতল পাহাড়। বোঝা মুশকিল যে এটাও রাজস্থানেরই অংশ। সেখানে পাহাড়ের কোলে রয়েছে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ফ্রেম-বন্দি করার জায়গা। যেমন - টৌড রক, হানিমুন পয়েন্ট, সানসেট পয়েন্ট ও নাক্কি লেক। এছাড়াও মনশান্ত করার মতো স্থান রয়েছে। যেমন- অর্বুদা মন্দির, দিলওয়ারা জৈন মন্দির ও শান্তি ভবন। গরমের মাঝে এখানকার হঠাৎ ঠাণ্ডা আবহাওয়া খুব মনোরম।

এখান ছেড়ে এবার উদয়পুর, Venice of the East; লেকের শহর এবং এখানকার বিখ্যাত স্থান হল City Palace, Lake Pichola। উন্নত ও পরিচ্ছন্ন শহর একটি। অন্যান্য গ্রামগুলির থেকে ভীষণ আলাদা। এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য হল মহারানা প্রতাপ মেমোরিয়াল।

এখান থেকে এবার চিত্তোরগড়। সেখানকার রানা কুম্ভ Palace, রতন সিং Palace, পদ্মাবতী (Padmini Palace), মীরাবাঈ মন্দির এইসব বিখ্যাত স্থান ঘুরে; পথে আজমের শরীফ ফি ও পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির হয়ে সর্বশেষ শহর যাচ্ছি জয়পুর, রাজস্থান। The pink City ও Capital of Rajasthan. এখানকার রাজকীয়তা, মডার্ন চালচলনের সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন অন্যতম করেছে এই শহর তথা এই রাজ্যকে।

বিকেল ৫টা নাগাদ পৌঁছালাম জয়পুর। জনবহুল এলাকা, মেট্রো, ট্রেন, রাস্তাঘাট, মার্কেট পরিপূর্ণ করেছে এই শহরকে। রাত পেরিয়ে, পরদিন সকাল চললাম বিখ্যাত 'হাওয়া মহল' দেখতে। সিনেমা বা ক্যালেন্ডারে দেখা ছবির সাথে হুবহু একই রকম। হাওয়া মহল ছাড়াও ঘরের ও যন্তর মন্তর, Albert Hall, অম্বর ফোর্ট, বিড়লা মন্দির, জলমহল অত্যন্ত অসাধারণ দর্শনীয় স্থান। এছাড়াও এখানকার পুতুলনাচ, বানজারা নাচ ও গান আনন্দদায়ক।

একটানা ১৫ দিনের এই ভ্রমণকে স্মৃতিচারণ করে ও স্মৃতি হিসেবে এখানকার বিভিন্ন বিখ্যাত সামগ্রী (যেমন- Blue Pottery utensil, রাজস্থানী পাগড়ি, পুতুল, মিষ্টি ও অন্যান্য অনেক শৌখিন দ্রব্য, হস্তশিল্প, ব্রাশের নিয়ে রওনা হলাম বাড়ির পথে। মন খারাপ না করে বরং প্রকৃতি দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম- 'এমনিই কোনোদিন যাব, আবার কোথাও।'

-0-

তোমায় পাবো বলে

অমিত সরকার
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

ভেবেছিলাম-
একদিন ঠিকই ছুঁয়ে ফেলব,
দিগন্তের সেই মরীচিকা।
অতিক্রম করেছি বহু প্রান্তর,
ঘুরিয়েছি অনেক অনেক চাকা।
তবু বারংবার হোঁচট খেয়েছি,
ধুলোধূসরিত আঁকাবাঁকা,
সড়কে।
তোমায় দিতে চাই-
একমুঠো বসন্তের কুয়াশা,
পুরে কাগজের মোড়কে।
-0-

উইমেনস্ কলেজ

আব্দুল আজিজ উস্ সুবহান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

উইমেনস্ কলেজ; উইমেনস্ কলেজ।
তোমার কত নাম।
উইমেনস্ কলেজে পড়াই বলে
তাই আমাদের দাম।
অনেক কষ্টে এখানে এলাম
মনে অনেক আশা।
এখানে এসে পেয়েছি আমি
সবার ভালোবাসা।
ধন্য হব তখন আমি
যখন আরো হব বড়।
পড়বে মনে সবার কথা
আশীর্বাদ করো।

-0-

পরিবর্তন

ঋদ্ধিমা নায়ক
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

জীবনের রাস্তায় মেয়েটি বড়ো একা,
আশে পাশে যে দিকে তাকায় সবই দেখে ফাঁকা।
শুধুমাত্র মায়ের স্নেহের হাত মাথায় রাখা,
তার সময়ের সাথে বদলে গেছে মুখের সব বলিরেখা।
মেয়েটি চারিদিকে খুঁজে বেড়ায় বাবার আসল মুখ,
কিন্তু পরিবর্তে পেয়েছে শুধু বুক ভরা হাজারও দুঃখ।
চেয়েছে সে পুনরায় ফেলে আসা দিনে ফিরতে,
স্বপ্ন কি সব সত্যি হয় এই কংক্রিট জগতে।
না পারে ভুলতে, না পারে জিততে,
পারে শুধু কান্নায়, অবিশ্বাসে মিথ্যে ভালোবাসায় ভেঙে পড়তে।
জগত স্বরূপ বাবার কাছে না পেয়েছে স্নেহ, না ভালোবাসা,
পেয়েছে কেবল অত্যাচার, দুঃখের নানান পরিভাষা।
হাসি তো সে ভুলেই গেছে চোখের কোণে ভাঁজ পড়েছে,
মনে তার বিশ্বাস, ভরসা, ভালোবাসার পথ বেঁকেছে।
দূরে, বহু-দুরে...
খুঁজে পায় এক নতুন ছন্দের পথ,
তবুও করেছে নিজের কাছে শপথ।
হারবে না, হারবে না সে!
লড়াই, অর্ন্তযুদ্ধ তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সুদূরে,
এই উদ্যোগেই পথ চলা কি তার আদৌ সার্থক হবে?
মেয়েটি তার অসম্পূর্ণ জীবনে পাবে কি ভরসা, ভালোবাসার হাত,
যার ছোঁয়ায় পূর্ণ হবে তার সকল দুঃখের রাত।
আসবে এক নতুন সুপ্রভাত।।

-0-

রুম নম্বর ১৮

জয়িত্রী ঠাকুর

অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আমাদের প্রায় সকলেরই ছোটবেলায় প্রিয় পুতুল, প্রিয় সাইকেল, প্রিয় পেন এরকম অনেক প্রিয় জিনিস ছিল, তাই না? সেগুলো আমরা আজও ভুলিনি যে যতই বড় হয়ে যাই না কেন।

আমার ঠিক ছোটবেলার কথা বলা যায়না, কিন্তু যখন কলেজে স্নাতক পড়তে যাই বাড়ি থেকে দূরে তখন প্রথমবার হোস্টেলে থাকতে হয়। কারণ যাতায়াত করে পড়া আর হত না। এখনও স্পষ্ট মনে আছে যেদিন হোস্টেলে শিফট হলাম আর মা-বাবা চলে গেল ভীষণ মন খারাপ আর অভিমান হয়েছিল। তারপর রুম এ গিয়ে আরও কান্না পেয়ে গেল, এত ময়লা-আবর্জনা, বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছিল আর চারিদিক ঝুল এ ভরা। মনে হল 'এখানে থাকবো কী করে?' অগত্যা ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। আর যখন শেষ হল তখন প্রায় দিন গড়িয়ে গেছে। সারাদিন এত পরিমাণ কাজ করে সমস্ত শরীরে সে যা ব্যথা, তার সাথে দুঃখ আর নতুন জায়গা। তার উপর ঘরটা আমার বিন্দুমাত্র ভাল লাগছিল না বলে নানা কারণে সারারাত জেগেই ছিলাম। ভোরবেলা চোখ লেগে গিয়েছিল, অ্যালার্ম ঘড়ির আওয়াজে চোখ খুললাম। ঘুম ভেঙেই মনে পড়লো কোথায় আছি আর সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হয়ে পড়লাম। হোস্টেলে যারা থেকেছে জানে সেখানে সবকিছু সময় এ বাঁধা। সমস্ত কিছুতেই নিয়ম আর শৃঙ্খলা এবং সমস্ত কিছুই পরিমেয়। যাইহোক্ এই ভাবেই একটা একটা দিন কষ্টের সঙ্গে পার করতাম। মনে হত কবে বাড়ি যার। বাড়ি যাওয়ার কথায় অজুহাত খুঁজতাম। এই ভাবেই ক'মাস কাটার পর অনেক বন্ধু হয়েছে। আর নতুন নতুন ব্যাপারটাও নেই। প্রায়ই এর ওর রুমে সন্ধ্যাবেলা চা-মুড়ি-চপ, নানান মুখরোচক খাওয়া, গল্প-আড্ডা হত। আবার রাত জেগে পরীক্ষার আগে পড়া। তখন প্রায়ই হোস্টেলে লোডশেডিং হত আর মোমবাতি জ্বালিয়ে ভূতের গল্প করা আর তারপর বাথরুমে দল বেঁধে যাওয়া। অখন অন্তাক্ষরী, মেমোরি-গেম, আরও নানান খেলা খেলতাম। (স্মার্ট ফোন আসেনি) পুজোর আগে যখন মাইক-এ গান ভেসে আসতো তখন বাড়ি যেতে মন হাঁসফাঁস করতো।

মায়ের হাতে বানানো জানলার পর্দা ছিল আমার রুমে, সাদা পর্দায় হলুদ ফুল এর এমব্রয়ডারি যাতে বাড়ি বাড়ি অনুভব হয়। রথের মেলায় কেনা একটা মাটির

খাঁচাও ছিল তাতে মাটির পাখি ছিল। যেটা যত্নে জানালায় ঝোলানো ছিল আর সেটা যখন হাওয়ার মৃদুমন্দে নড়তো ভারি ভালো লাগতো দেখতে। আমার রুম থেকে লম্বা রাস্তা দেখা যেত। যার দুধারে বড় বড় গাছ। সেটা দেখেই অনেক সময় কেটে যেত।

আমাদের ক্যাম্পাসে অনেক রকমের গাছ ছিল- আম, কাঁঠাল, নারিকেল, দেবদারু, পেয়ারা, বেল। গরমকালে সেই কাঁচা আম মাখা আর সবাই মিলে খাওয়া এক অনবদ্য অনুভূতি। তার সাথে বেলের সরবত তৈরি করা। যে রবিবার বাড়ি হয়তো কোন কারণে আসতে পারিনি, সেদিন বেশিরভাগ হোস্টেলের ছাত্রীরা নানান ধরনের রন্ধনকার্যে মেতে থাকতো। যেমন- মাংসের ঝোল, ঘুগনি, এমন কি পিঠেও বানানো হত, তবে সবই অল্পস্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে। সব কাঁচা মশলাই থেঁতো হত, আর নানান ভাবে আবিষ্কার করে। তবে শেষে স্বাদের সাথে কোনো আপোষ ছিল না। প্রায়শই টিউশন থেকে ফেরার পথে আমি পদ্মপাতায় মোড়ানো সুবাসিত শ্বেত রং-এর জুঁই ফুল নিয়ে ফিরতাম। আর তার সুগন্ধ দুদিন রুমে থাকতো। কবে যে রুমটা আমার ঘর হয়ে গেল টের পাইনি। ঘরের দেওয়ালে রবিঠাকুরের ছড়া, কবিতা আর পেন্সিল স্কেচ-এ ভরা নানান স্মৃতি আজও আছে কিনা জানি না।

যেদিন আবার পড়া শেষ করে সব সংসার নিয়ে ফিরে এলাম, সেদিন 'সব' নিয়ে আসতে পারিনি। আর তারপর কোনোদিন ফিরেও যাইনি দেখতে। সেই "আমার রুম নম্বর ১৮"।।

-0-

নারী

ঝিনুক সিংহ
ছাত্রী, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

নারী কিনা শাড়িতেই
সীমাবদ্ধ জীবন
বেশি উড়তে চাইলে
হবে তোমার মরণ।
ঘরে কাজ করলে ভালো
বাইরে গেলেই মন্দ
'Character'-এর বিচার করে
রাস্তার কিছু ভণ্ড।
তুমি অনন্যা, তুমি সুন্দর, তুমি সর্বশক্তি
নারীর জন্য ব্যবহার হয়না কেন
এরকম সব যুক্তি।
পড়াশোনা করলে বেশি
সংসার কিনা হয় শেষ
তাই এখন হয়েছে সমাজের
এ বেশ বেশ বেশ।
নারীর শরীরে জন্ম নিয়ে
নারীকেই জানাও ধিক
হবে যখন কর্ম বিচার
পাবিকি কোথাও ভিখ।
মহাকাল হয়েও তিনি
দেবীর কাছে নত
রাধা রাধা করতে থাকেন
জগৎপালক তত।

মা, বোন, মেয়ে নামে
আমরা যাদের পূজি
দেবীর থেকে কম কি তারা
দেখি যাদের রোজই।
এক হাতে জগৎ ধরে
আরেক হাতে স্নেহ
দশভূজা বলি যাদের
তাদেরও খবর নিও।
মেয়ে হলেও মানুষ তারা
যত্ন তাঁদেরও লাগে
চিনতে শেখো খাঁটি সোনা
সময় থাবাতে আগে।
ভালোবেসে সম্মান দিয়ে
রাখতে পারো যদি
হবে তুমি সর্ব সুখি
হবে সর্ব ধনী।
এমন না হয় পেরিয়ে সময়
আফসোস তোমার হল
থাকতে কদর করলাম না যে
হায় এ কি হল।
নারী কিনা শাড়িতেই
সীমাবদ্ধ জীবন
অন্যকে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই
শেষ নারীর জীবন।

-0-

উড়ে আসা তারা

দেবদীপ ধীবর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলেজ ক্যাম্পাস সেদিন লোকে-লোকারণ্য। শঙ্খধ্বনি, চন্দনের ফোটা, ফুলের তোড়া, ধূপের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। সময় আসে সময় যায়। এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায়। মধ্যিখানে রঙিন স্বপ্ন। তারি মাঝে আমাদের কলেজ তখন টিনেজার। এখন অনেক কিছু বদলেছে, বদলে গেছে। অনেক কিছু হারিয়েওছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা কি হারালো কি বদলালো? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফিরে পেলাম শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ। মুছে যাওয়া চন্দন। হারিয়ে যাওয়া ধূপের গন্ধ। এবং চলে যাওয়ার আগাম বার্তা। একটা বছর হাসতে হাসতে কেমন যেন পেরিয়ে গেল। ভাবতে অবাক লাগছে, পুরানো খাতার নতুন মলাটে আজ দ্বিতীয় তৃতীয়। এইতো সেদিন, কলেজ দেখতে এসেছিলাম। এইতো সেদিন অনুভব করেছিলাম জীবনের রঙে রাঙানো তুলিটার টান। তার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমরাও কখন যেন রঙিন হয়ে গেছি। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আমারও রং বদলেছে। আজ যদি আসতে সামান্য দেরি হয়ে যায়, হাজারো চোখের ভিড়ে খুঁজি আমার হারানো সেই পুরানো চোখ। সেই চোখের জলবিন্দু, যা আমার গাছে প্রাণ এনে দেয়। তার শরীরের মাটি আমার প্রাণে খাদ্য যোগায়।

বছর থেকে বছরে হেঁটে চলেছে সে, তারই পথে পথ না জানা নতুন পাখির দল। খুঁজে বেড়াই নতুন কিছু। খুঁজতে খুঁজতে তারা ক্রমশ আবিষ্কার করে একটা রঙিন পাতা। তাতে রক্ত নয়, রং লেগেছিল। যা দিয়ে কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। উত্তরের হাওয়ার টানে রং মাখা পাতাটা বিড় বিড় করে বলে উঠলো – "আমার কলেজ মানে কোন পার্টি বাজি নয়। আমার কলেজ মানে মস্তানি দাদাগিরি নয়। আমার কলেজ মানে শুধু শিক্ষক-ছাত্র নয়। আমার কলেজ কোনো জল রঙের ছবিও নয়। আমার কলেজ মানে এক খোলা আকাশের নিচে আমরা সবাই। আমার কলেজ মানে রঙিন ছবিতে সোঁদা মাটির গন্ধ। আমার কলেজ মানে হাজারো দর্শকের আঙুল আমাদের দিকে। আমার কলেজ তোমার-আমার-আমাদের স্বপ্নের ভালোবাসার।" এতক্ষণে উত্তরের বাতাস পাখা মেলতে শুরু করেছে। আমরাও একদিন ধীরে ধীরে দূরে হারিয়ে যাচ্ছি!

১৯.০৯.২০০৪

ভাঙাগড়া

পারমিতা মন্ডল
ছাত্রী, রসায়ন বিভাগ

মনের চলন সুষমামন্ডিত স্বপ্নে
কঠিন বাস্তব ভাঙবে কী অতি অল্পে?
রঙিন ময়ূর পুচ্ছ হতে
তিনরঙা পেখম তুলি হাতে
দোয়াত-কালির মস্ত খেলার উন্মাদে,
হারিয়ে গিয়ে নীল সমুদ্র জলে
মারিয়ানা খাতের গভীরতম স্থানে,
ক্ষুদে জোনাকি আসবে আলো নিয়ে-
চারিদিক আলোয়-আলোয় ঝকমকিয়ে
মৃদু-মৃদু শীতল বাতাস আলতো স্পর্শ করে
পুনরার হৃদয় ভঙ্গের হৃদয় দেবে নিজ হাতে গড়ে।

-0-

বৃন্দাবনের মা

পূজা মণ্ডল
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

'মা' এই শব্দটি আমাদের ভারতীয়দের কাছে খুবই আবেগের। আমরা ভারতীয়রা 'মা'-কে জীবনের সর্বোচ্চ আসনে বসাই। কখনও কখনও তা ঈশ্বরের থেকেও উচ্চস্থানে হয়। আসলে ভারতবর্ষে 'মা' সর্বদায় পিতার থেকে অধিক পূজিত হন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা পুত্রের পরিচয় পিতার বদলে মায়ের নামের দ্বারা হতে দেখি। যেমন- অঞ্জনি পুত্র হনুমান, গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম, যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। বর্তমান সময়েও আমাদের কাছে মা বলতে যে শুধু নিজের জন্মদাত্রীকে বুঝি তা কিন্তু নয়। আমাদের কাছে দেশ হল দেশমাতা, নদী হল মা, গাই গরু হল গোমাতা। বাড়ির সমস্ত আত্মীয়দের মধ্যে যারা স্ত্রী মানুষ তাদের সকলকে মা বলে সম্মান জানাই- ঠাকুমা, বড়মা, কাকিমা, মাসিমা ইত্যাদি। তাহলে বলাই যায় ভারতবর্ষে সমস্ত মানুষেরা তাদের মায়েদের এ জগৎ এর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে রেখেছেন। সমস্ত মায়েদের জীবন সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ। কিন্তু, এটাই কি বাস্তব? বাস্তব ছবিটা ঠিক কেমন?

আগের বছর বৃন্দাবন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। যা শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি, হিন্দু ধর্মের এক পবিত্র স্থান। সেখানে বিভিন্ন মন্দির দর্শন করে মনটা শান্তিতে ভরে গেল। তবে গোপীনাথ মন্দির দর্শনে এক ঘটনা ঘটল। আমি মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাকে বাংলায় কথা বলতে দেখে এক বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি বাঙালি? আমি উত্তরে হ্যাঁ বলতে উনি বললেন আমিও বাঙালি। আমাকে ছেলে বলল বসতে ওর সাথে এসে ছিলাম। মা কই এলো না তো? এই বলতে বলতে উনি চলে গেলেন। ওনার কথাগুলো খুবই অসংলগ্ন মনে হল, কিন্তু তিনি এই ছোট্ট আলাপে আমাকে বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ফেরার পক্ষে আমি সারা রাস্তায় ওনার কথা ভাবতে ভারতে এলাম। কে ছিলেন তিনি, কী তাঁর পরিচয়? একজন বাঙালি বৃদ্ধা একা কী করছেন বৃন্দাবনে। ওনার ছেলে কি ওনাকে ছেড়ে চলে এসেছেন। ওনাকে দেখে মানসিকভাবে অসুস্থ মনে হয়েছিল, তবে কী উনি অসুস্থ বলেই ওনার ছেলে ওনাকে রেখে চলে আসে? নাকি নিজের ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে উনি এভাবে অসুস্থ হয়ে গেছেন। ওনার বাড়ি কোথায়? আমারই শহরে, নাকি আমার শহর থেকে অনেক দূরে? তিনি এখন কী করছেন? বাঁচার লড়াইটাই বা কী করে চালাচ্ছেন ? এই সবই ভাবতে ভাবতে মনটা ভার হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের

বাসভূমিতে একদা মা যশোদা যেভাবে কৃষ্ণের বিরহে কাতর হয়ে পাগল পারা হয়েছিলেন। আজ এত হাজার বছর পরে আরেক মা ও তার সন্তানের বিরহে পাগলিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার কাছে মা যশোদা ও এই বৃন্দাবনের সেই মা'টির মধ্যে অমিল নেই। তাদের দুজনেরই যন্ত্রণা একইরকম। তবে তার পুত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন মিল আছে কী না তা বলতে পারব না। অনেক প্রশ্ন মনে জাগলো কিন্তু তার একটিরও সঠিক উত্তর আমি খুঁজে পেলাম না।

আজ সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বুঝলাম আমরা ভারতবাসীরা দেশকে মা বলি অথচ, এই দেশের কত মা সেই বৃন্দাবনের মায়ের মতো অবহেলায়-অনাদরে মারা যাচ্ছেন। সেই বৃন্দাবনের মা সন্তান ও সংসার হারিয়ে যেমন অসহায় তেমন কত মা আছেন যারা সংসারে থেকেও অসহায়। এই মায়ের দেশের মায়েরা কতটা অবহেলিতও অসহায় সেটা অনুভব করতে পারলাম। এবং উপলব্ধি করলাম যেদিন এই বৃন্দাবনের মায়েরা সহায় হবেন হয়ত সেই দিনই এই ভারতমাতা আমাদের প্রতি সহায় হবেন।।

-0-

নম: গুরুদেব

প্রতিমা বিশ্বাস
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

তুমি যে এত স্বচ্ছ
তুমি পৃথিবীর বুকে বয়ে যাচ্ছ।
তোমার প্রবহমান ধারা,
করেছে আমায় বাড়ি ছাড়া।
তোমার তরতর শব্দ
আমার হৃদয়কে করেছে নিস্তব্ধ।
তুমি যে কত স্নিগ্ধ,
তোমায় দেখে আমি হয়েছি মুগ্ধ।
তুমি যে কত প্রবাহিণী
শিক্ষক- শিক্ষিকা প্রত্যেকের গুরু
আদর্শের-ই প্রতীক,
তাঁদের দেখানো পথে হাঁটি
সকল ছাত্র-ছাত্রী পথিক।
লেখাপড়া শিখিয়ে যারা
জ্বালেন জ্ঞানের আলো।
শাসন করেন জীবন গড়েন
সকলকেই বাসেন ভালো।
শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন আলোর পথের
সত্য নির্ভীক যাত্রী
অনুসরণে পথ চলে
সকল ছাত্র-ছাত্রী।
মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষা
জন্ম থেকেই শুরু

মায়ের পরে শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন
সকল ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞানের গুরু।
শিক্ষক-শিক্ষিকা ব্যস্ত থাকেন,
জ্ঞান ছড়ানোর চাষে।
সম্মান করলে তাঁদের
সাফল্যতা আসে।
এঁরা হলেন শ্রদ্ধার পাত্র
শিক্ষার অতি ভালো মানুষ।
তাঁরাই আবার গড়ে তোলেন
ডাক্তার-উকিল সভ্য মানুষ
সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা-মাস্টার
আমাদের সমাজের মিস্টার,
শিক্ষক মানে যিনি হলেন আমাদের শিক্ষাদাতা
তাঁরাই আবার আমাদের সকলের দ্বিতীয় পিতামাতা
তাঁদের চরণে-প্রণাম জানাই,
তাঁরাই যে পরম জ্ঞানের গুরু।

-0-

প্রাচীন চীনের নারীর সমাজ

প্রিয়া বাগ্‌দি
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

নারী এই দুটি সরল অক্ষর শুনতে যতটা সহজ বাস্তব ঠিক ততটাই কঠিন। বিশ্বের যেখানে তাকায় সেখানেই নারীদের জীবন অত্যন্ত সংঘর্ষ পূর্ণ। যা ভারত বা চীনে যেখানেই হোক দেখা যায়, ঠিক তেমনই আমরা চীনে নারীদের নিজের অধিকারের জন্য সংঘর্ষ করতে দেখি। আমরা জানি প্রাচীন চীনের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সেখানে নিজ সিদ্ধান্ত এমন কি বিবাহের ক্ষেত্রেও নারীদের মতামতের কোন দাম ছিল না। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে দেহ পণ দিত অর্থাৎ পাত্রীকে পাত্রপক্ষ কিনে নিত ও মেয়েকে ছোট থেকে বড় করার জন্য যত খরচ হয়েছে তা পণ দিয়ে মিটিয়ে দিত। তার থেকে বোঝা যায় পাত্রী বিয়ের পর সুখী হত না। বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলেও তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার কনফুসিয়াস অনুগামীরা নারীদের জন্য একটি কুপ্রথা প্রণয়ন করেন। সেটি হল, "যদি মেয়েরা মোরগকে বিয়ে করে, তাকে মোরগের পেছনে যেতে হবে; মেয়েরা যদি কুকুরকে বিয়ে করে, তাকে সেই কুকুরের পেছনে যেতে হবে; এবং মেয়েরা যদি খুঁটিকে বিয়ে করে, তবে তাকে সারা জীবন সে খুঁটিকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"একথা শুনতে বর্তমানে আমাদের একটু হাস্যকর লাগলেও তবে অতীতে ছিল ঠিক ততটাই ভয়ংকর। শুধু এর মধ্যে থেকে শোষণ সীমাবদ্ধ ছিল না তাদের সমাজে নারীদের মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়েও অত্যাচার করা হতো।

এরকমই একটি কুপ্রথা হল 'পদবেষ্টনী' মেয়েদের ৫ বছরে পা দেওয়ার আগে পায়ের কচি আঙ্গুলগুলিকে বেঁকিয়ে পা দুটি পাতার তলায় এসে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো প্রায় ১০-১৫ বছর। সমাজের চাপে এই অমানুষিক কাজ করতো তার নিজয় মা মেয়েটি এইভাবে এক ধরনের পূজং যবন্ত্র, প্রেমে বস্ত্র তে পরিণত হলো। এ বাধা ভাঙ্গা পা কবিদের চোখে 'সোনালী লিলির' মতো। চীনা শিল্পীদের চোখে এই ভাঙ্গা পা নারীদের কামোদ অঙ্গ। এটা জানলে বিস্মিত হয় যে তাং চিত্রকরের নারী দেহের জননেন্দ্রিয় ছবি আঁকলেও কখনোই ভাঙা পায়ের ছবি আঁকতেন না। মেয়েটির বিয়ের পরে এই বাধা বা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের চোখে তাকে শ্রদ্ধার পাত্রী করে তুলতো; কারণ এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করার এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা ক্ষমতা ও মানসিকতা তার

রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভালো যে 'পদবেষ্টনী' রীতি থাকার ফলে চীন দেশের নিত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেনি।

বহুকাল ধরে নারীরা এইরকম কঠোর যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করার পর নিজেদের অধিকারের জন্য রুখে দাড়ায়। চীনের বক্সার বিদ্রোহ ও কৃষক বিদ্রোহ তে নারীরা যোগ দেয়। এইসব পরেও তারা নিজেদের জোরদার করে তোলার জন্য নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে তাদের দাবি ছিল, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, পুরুষের বহু বিবাহ ও মেয়েদের কেনাবেচা বন্ধ করা, স্বেচ্ছায় বিবাহ ও বিচ্ছেদের অধিকার, ভোটদানের অধিকার প্রভৃতি। এরা বিভিন্ন নারী সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত ছিল' সাংহাই সোশ্যাল ক্লাব ফর উইমেনস সারফেজ', 'মিলিট্যান্ট উইমেন্স সোসাইটি', ফিমেল অ্যালায়েন্স' ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় যে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হলে তার সংখ্যা বহু বেড়ে যায়। তাদের এই নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের যিনি নারীদের সমর্থন করেন তিনি হলেন মাও সে তুং। তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজে নারীদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য পরবর্তীকালে নারীদের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনলেও সমাজের চিহ্নগুলি এত সহজে মিলিয়ে যায় না,

এজন্য বহু সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। নতুন সমাজে পুরনো কিছু সমস্যা থাকলো না আবার কিছু সমস্যা ছিলও; যেমন, ভারী শিল্প পুরুষের আর হালকা শিল্প মেয়েদের, গৃহস্থালির কাজ শুধু মেয়েদের পুরুষদের নয়, বিভিন্ন পার্টি-কমিটি ও শ্রমিকের কাজে মেয়েদের কম প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি। এইসব চীনের সমাজে নানাবিধ প্রশ্ন বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে। তবে নারীরা যে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে লড়াই করেছেন তার অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য।

-0-

অপ্রাপ্ত ভালোবাসা

প্রিয়াংকা ঘোষ
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

গ্রামের নাম বকুলপুর। শান্ত, নিরিবিলি। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। সেখানে এক তরুণী ছিল তার নাম রাধা। সে ছিল নিম্নবিত্ত বাড়ীর মেয়ে। রাধার বাড়ীতে রাধা ছাড়া তার মা বাবা থাকতো। রাধার পড়াশোনা করার ইচ্ছা খুব। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তার বাবা মার রাধাকে পড়ানোর সামর্থ্যও ছিল না। তাছাড়া তাদের গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনা শেখার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। রাধা ছিল খুবই শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, তাই সে কোনোদিন তার বাড়ী আর গ্রামের বিপক্ষে গিয়ে পড়াশোনা শিখতে চায়নি। রাধার বন্ধু-বান্ধব বা সে রকম

কোনো প্রিয় সঙ্গী ছিলনা। তাই সে তার মনের কথা কাউকে বলতে পারতো না। বিকাল বেলা রাধার সময় কাটতো তাদের গ্রামের নদীর পাড়ে। হঠাৎ সেই নদীর পাড়ে এক তরুণ তমালের সাথে তার পরিচয় হয়। এবং তাদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়। রাধা তার মনের সব কথা তমালের কাছে বলতে পারে। তমাল ছিল জমিদার বাড়ীর ছেলে। সে কলকাতায় পড়াশোনা শিখেছে। রাধা আর তমাল বিকালে নদীর পাড়ে প্রতিদিন দেখা হতো। একদিন রাধার বাবা তমাল আর রাধাকে একসঙ্গে দেখে ফেলে। বদনামের ভয়ে মাত্র পনেরো বছর বয়সে রাধার বিয়ে ঠিক করে দেয়। রাধা যখন তার বিয়ের কথা জানতে পারে, তখন সে অনেক বার তার বাবাকে বোঝায় যে রাধা আর তমাল এর মধ্যে শুধুই বন্ধুত্ব কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক নয়। কিন্তু তার বাবা সে কথা বিশ্বাস করে না। সেদিন বিকালে নদীর পাড়ে তমালের সঙ্গে দেখা হলে রাধা তাকে সব কথা বলে। তমাল রাধার কথা শুনে বলেছিলো তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো। আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাবো কিন্তু রাধা তমালের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কারণ রাধা ছিল খুবই শান্ত প্রকৃতির সে চাইতো না, তার জন্য তার বাবা মার কোনো বদনাম হোক। এটাই ছিল রাধা আর তমালের শেষ দেখা। এরপর রাধার বিয়ে হয়ে যায় তার বাবা-মার দেখা পাত্রর সাথে। রাধা নিজের সংসারে মন দিলো। আর তমাল প্রতিদিন নদী পাড়ে এসে রাধার কথা ভাবতে থাকলো। প্রতিদিন তার রাধার কথা মনে পড়তো। রাধার কথা ভেবেই দিন কাটতো তার। এই কারণে তমাল আর নিজের বিয়ে বা সংসার করার কথা ভাবতে পারলো না। তমাল এখন বুঝতে পারলো রাধা আর তার মধ্যে শুধু বন্ধুত্বই না ভালোবাসার সম্পর্কও ছিল। তার মনে

রাধার জন্য ভালোবাসা সে তার মনেই রেখেছিল, প্রকাশ করার সময় আর ছিলনা তার কাছে। তমাল রাধার প্রতি অপ্রকাশিত ভালোবাসা নিয়ে দিন কাটাতে থাকলো। সাক্ষী থাকলো নদীর পাড়, কুলুকুলু বয়ে চলা নদীর জল আর ঝুরি নামা বুড়ো বটগাছ।

-0-

যখন ছোটো ছিলাম

মৌটুসী মন্ডল
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

প্রিয় ছোটোবেলা, আজ তোমাকে বড্ড মিস করি জানো তো। আর একটা সময় বড়ো হব, কলেজে পড়ব এইসব ভেবেই তোমাকে কখন যে হারিয়ে ফেললাম বুঝতেই পারলাম না। ছোটোবেলা গণ্ডি পেরিয়ে নিজের অজান্তেই হঠাৎ একদিন বড়ো হয়ে গেলাম আর হারিয়ে গেল - 'ছেলেমানুষ ছেড়ে দাও', 'এই বয়সে তো দুষ্টুমি করবেই', 'ওকি এত বোঝে নাকি'? এই রকম আরও অনেক মিষ্টি মধুর কথা। 'ছোটোবেলা' আমাদের জীবনে খুব ছোটো সময়ের জন্যই আসে। আর ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো সারাজীবন আমরা আমাদের মধ্যে নিয়ে বেঁচে থাকি। ছোটোবেলার সেই স্কুলের ব্যাগটা খুব ভারী লাগত। ভাবতাম কবে যে বড়ো হব। আর দাদা-দিদিদের মতো দু-চারটে বই নিয়ে কলেজ যাব ব্যাগটা ভারী হবে না। তখন বেশ মজা হবে। কিন্তু এখন দেখছি বাস্তব জীবনের চাপ, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব, পরিবারের ভার এই সবের তুলনায় ছোটোবেলার ওই স্কুল ব্যাগটা অনেক হালকা ছিল।

এই 'ছোটোবেলাটা' অবশ্য সবার জীবনে সুখের হয় না। কেউ কেউ ছোটোবেলা থেকেই জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ে। চিনে নেয় আমাদের চারপাশের বাস্তব সমাজটাকে। আবার অনেকে ছোটোবেলায় বুঝেই ওঠে না, আমাদের বাস্তব সমাজের স্বরূপটি। যেখানে মানুষ কখনো নিজের ভেবে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। আবার কখনো নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকে। ছোটোবেলার সেই দুষ্টুমি, ইয়ার্কি, আহ্লাদিপনা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে যে ন্যাকামো মনে হয়, তা আমাদের চারপাশের লোকজনই বুঝিয়ে দেয়। ছোটোবেলায় টিফিনের জন্য পাওয়া সেই দু-টাকাটা যে আনন্দ দিত, এখন হাতে পাঁচশো-হাজারের নোট এলেও সেই আনন্দটা আর আসে না। আজও মনে পড়ে ছোটোবেলার সেই কান্নাকাটি, লুকোচুরি, কুমির ভাঙা আর কত কিযে। এখনকার ছোটোবেলাতো ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, সোশাল-মিডিয়ায় ডুবে। কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আনন্দ কিংবা আশ্চর্য এক মজা খুঁজে পেতাম। ছোটোবেলার সবচেয়ে বড়ো অপমান ছিল "তুই তো খেলতে পারিস না, যা তুই দুধভাত!" কিন্তু এখন বড়োবেলাটা বড্ড বেশি কঠিন লাগে। তাই প্রিয় ছোটোবেলা সবার জীবনে একটু বড়ো সময়ের জন্য এসো....।

-0-

এক বিপ্লবী নারীর গল্প

রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

সে সময় উনি খুব সম্ভবত ঢাকায় (মতভেদে চট্টগ্রাম হতে পারে) তবে ঘটনাস্থল কোথায় তা এখানে ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং ঘটনাটাই রোমাঞ্চকর। সে সময় দিদিমার এক দূরসম্পর্কিত ননদ, যাকে মায়েরা খুকু পিসি বলতন ঐ এলাকায় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

একদিন ভরদুপুর, বাড়ির সকলকে খাইয়ে দিদিমা সবে খেতে বসবেন এমন সময় তাঁর ননদটি হন্ত-দন্ত হয়ে ঢুকলেন ঘরে। চুল উস্কো, খুস্কো। হাতে একগোছা চিঠি।

তাঁর বিপ্লবী যুবক বন্ধুর লেখা।

-"বৌদি, পুলিশ আসছে কিছু একটা ব্যবস্থা করো।"

দিদিমা তখন সন্তানসম্ভবা। তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ছিলেন।ননদের হাত থেকে চিঠির বোঝা নিয়ে ঢুকিয়ে ফেল্লেন কাপড়ের নীচে, একদম পেটের মধ্যে। এদিকে পুলিশ ততক্ষনে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে গট গট করে ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে। জ্বলন্ত উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন সেইসব গোপন তথ্যে ভরা চিঠি। বাড়ির বৌটিকে কেউ সন্দেহ করলো না।

এর কয়েক বছর পর। মহিলার বিপ্লবী বন্ধুটি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় প্রান দিয়েছেন। একদিন দেখা হয়ে গেলো ঐ ননদটির সঙ্গে। শাড়ি গয়নায় সুসজ্জিতা, বিবাহিতা এক নারী। আগের সেই ডাকাবুকো মেয়েটির চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। স্বামীর সঙ্গে আলাপ হলো। তখনকার ডাকসাইটে সিভিল সার্ভিস অফিসার। মা তাঁর নামটি বলে থাকলেও আজ মনে নেই। রাখার দরকার ও মনে করিনা। শুধু মনে পড়ে সেই মানুষটির কথা, যিনি শহীদ হয়েছিলেন।বিপ্লব করাটা তাঁর কাছে আর যাই হোক শখের ব্যপার বা খেলা ছিলো না।

-0-

এক পায়ের চড়ুই

রানী বাল্মীকি

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

রোদের এই মায়াবী দিনে।
কল্পনা জগতের হারানো ক্ষণে।।
দেখতে পাওয়া সেই ছোট্ট প্রাণে।
ছিলনা সংঘর্ষহীন তারও জীবনে।।
মানবতা হারায় স্বার্থের জগতে।
ছোট্ট চড়ুই হারায় সভ্যতার জগতে।।
হঠাৎ করে বোধ জাগলো মনের কোনে।
কেন এত ব্যাকুলতা তার ছোট্ট প্রাণে।।
তার নাইবা আছে দুই পায়ের ছায়া, এক
পায়েই পূর্ণ সে সফলতা অর্জনে।
ওই দেখো প্রতিবন্ধী ছোট্ট চড়ুই, সফল সে
বাঁচার ইচ্ছে পূরণে।।
সে যেন দেখাচ্ছে, সেও সমর্থ প্রতিবন্ধকতার
অভিশাপ মোচনে।
জাগরিত শব আছে বহুজনে, জাগরিত প্রাণ
আছে কয়জনে।।

-0-

ভাষা

রিয়া দে
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

ভাষায় পারে ভাষাকে চেনাতে,
ভাষায় পারে ভাষা-হারা করতে।
ভাষায় ভাষায় হয় শব্দ,
ভাষাতেই ভাষা হয় জব্দ।
ভাষাকেই মানুষ করে সম্বল,
ভাষা ছাড়া হয় দুনিয়াটা অচল।
ভাষায় ভাষায় হয় যুদ্ধ,
সেই ভাষাতেই ভাষা কারারুদ্ধ ।
ভাষাতেই পায় যারা খাদ্য
ভাষাতেই উচ্চারিত শ্রাদ্ধ।
ভাষা যত থাকে চুপ,
ভাষা তত হয় বিরূপ।
ভাষাতেই ভেসে যাক বাকি সব
ভাষায়-ভাষায় বেঁচে থাক আত্মগত কলরব।

-0-

মন-পাখি

শতাব্দী মুখার্জী
(শিক্ষিকা, ওয়েবেল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন)

ছোট্ট পাখি যদি হতাম,
উড়ে বেড়াতাম ডালে ডালে,
খড়কুটো দিয়ে ঘর বানিয়ে নিতাম,
হাওয়ায় ভাসতাম তালে তালে।

থাকতো নাকো নিয়মের ধারা,
পেতাম নাকোনও বিষাদ-বেলা,
শৃঙ্খল ছাড়া মন-সুরা,
বইতো যে আমার প্রাণ মাতলা!

তাইতো পাখি তোকে দেখে,
ঠিক করেছি বন্ধন কেটে
উড়ব শুধুই লেখার শাখে;
বাঁচবো কেবল সুখপাটে।

-0-

মা

সরস্বতী ঘটক
ছাত্রী, কম্পিউটার সায়েন্স

মা এর ডাকে খোকা শোনে
কী করে খোকা ব্যস্ত ফোনে?
Time নেই একদম হাতে
কলিযুগেরই আভাস ঘটে
শেখায় যারা হাঁটা চলা
special day-তে শুধু তাদের তুলে ধরা
নতুন ছন্দেয় পথ চলা
যেখানে হয়না মা বাবার সাথেই কথা বলা
বাইরে থাকা সন্তানেরা
মায়ের চিন্তায় সারাক্ষণ
মায়ের ফোনে তারায় আবার
রাখার চিন্তায় সর্বক্ষণ
মায়ের হাতেই ছেলের বড়ো হওয়া
উন্নতির সাথে চাকরি পাওয়া
শেষে তারাই ভুলে মাকে
টাকা হলে 'বৃদ্ধাশ্রমে' রাখতে আসে মাকে
মায়ের চোখে তখন সন্তান
মায়ের আঁচলের বন্ধনে থাকে
দীর্ঘকাল পেরিয়ে গেলেও
যারা রাখে না মায়ের খোঁজ
তারাই বলুক
মাকে রাখার কত বেশি বোঝ?
যে নিল তোমার চিরকাল খোঁজ।

-0-

তরঙ্গিণী

সুচন্দ্রা গরাই
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

তুমি যে এত স্বচ্ছ
তুমি পৃথিবীর বুকে বয়ে যাচ্ছ।
তোমার প্রবহমান ধারা,
করেছে আমায় বাড়ি ছাড়া।
তোমার তরতর শব্দ
আমার হৃদয়কে করেছে নিস্তব্ধ।
তুমি যে কত স্নিগ্ধ,
তোমায় দেখে আমি হয়েছি মুগ্ধ।
তুমি যে কত প্রবাহিণী
তোমার নাম তরঙ্গিণী।

-0-

ভাঙা-গড়া

সূর্য সরকার

অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

আজ থেকে ৩০ বছর আগের কথা। মিষ্টি শীতের এক সন্ধেবেলায় চ্যাটার্জীদের বাড়িতে একটা পুতুল এর মত সুন্দর মেয়ে হয়েছে। ঠাকুমা আদর করে নাম দিল রূপা। কিন্তু হলে কি হবে সবার মনে এক চিন্তা- 'মেয়ে তো কি আর করবে জীবনে'। একটু বড় করে বিয়ে দিয়ে দেবে। তাই বড় হওয়ার সাথে সাথে রূপাও যেন এটাকেই তার ভবিতব্য ভাবে। সেও বিশ্বাস করে এটাই হয়ত তার জীবন। এভাবেই মাস্টার ডিগ্রী করে, যখন সে বি.এড. করছে, এমন সময় তার জীবনে ফাল্গুনের ফুল ফোটে। হঠাৎ করে বিধাতা যেন সদয় হয় তার উপর।

তারপর কি হল?

তাহলে কি বিয়ে করে সংসার করছে সে এখন? কিন্তু ভগবান যে তার থেকেও বেশি কিছু ভেবে রেখেছিল। অনিবার্য কারণ বশত রূপা তার জীবনটা অন্যায় অত্যাচারের হাঁড়ি কাঠে বলি দিতে চাইনি। ভেঙে গেল বিয়ে। তারপর কাছের মানুষ থেকে শুরু করে সবাই শুরু করলো তার চরিত্র বিশ্লেষণ।

'মেয়েটারই দোষ বুঝলে। না হলে, অত ভাল ছেলে...' আরো কত কথা। শুধু অটুট থাকলেন অপূর্ববাবু। বাবা হয়ে মেয়ের পাশে থাকলেন। কিন্তু এবার কি করণীয় রূপার –?

হেরে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া, না লড়াই শুরু করা ঘুরে দাঁড়ানোর?

সব কষ্ট ভুলে সে নিজেকে ভর্তি করল বাইরের এক LAW-কলেজে। লক্ষ্য একটাই তার মত অসহায় মেয়েদের পাশে দাঁড়ানো। তারপর কেটে গেছে আরো বেশ কিছু বছর। হাইকোর্টের বাইরে আজ লোকে লোকারণ্য। একটা

অসহায় মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আর আসামী খুব বড় পলিটিশিয়ানের ছেলে। কিন্তু ঠিক বিচার কি পাবে, সেই হতভাগ্য মেয়ের পরিবার? সবাই তার অপেক্ষায়। অবশেষে সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় সেই আসামীর। কোথাও যেন শান্তি পায় সেই মৃত মেয়েটির নিষ্পাপ আত্মা। তবে সব থেকে বড় হাত যার এই ন্যায় বিচার পাওয়ানোর পিছনে, সবাই তাকে দেখার জন্ম

অপেক্ষায়। ঐ তো সেদিনের সেই মেয়েটা। দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। আর অনেকগুলো হাত তাকে একবার ছোঁয়ার জন্য প্রতীক্ষায়।

রূপার জীবন একবার ভেঙে গেলেও সে নিজেকে গড়েছে নতুন লড়াই-এর জন্য। তাই সবার জীবনে ভাঙা থাকবেই, কিন্তু গড়াটা আপনার হাতে।

আপনি রাজি তো?

১২.০৮.২০২২

-0-

চেতনা

স্মৃতিকণা ঘোষ
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

হৃদয় খুঁড়তে হলে
ভালোবাসার জন্য খোঁড়ো
হিংসার প্রভাব তো
প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত।
তোমার নির্মল চাহনিতে
ভরে উঠুক এ ধরা
তোমার কোমল ছোঁয়ায়
বিশ্বাসের দৃঢ় প্রলেপ
লাগিয়ে দাও, হীনজনের বুকে।
তোমার মমতা ছড়িয়ে থাক
ধু ধু প্রান্তর হতে
দূর দূরান্ত সমুদ্রে।

-0-

आखिर क्यों

निधि कुमारी

विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

क्यों छोटी उम्र में ब्याह दी जाती है लड़कियां?
बचपन उनका गुम हो जाता है ससुराल की गलियों में।
क्यों कहते हैं बड़ी होकर तुम्हें अपने घर जाना है?
और वहां तक पहुंचाने की बड़ी कीमत अदा करनी है।
क्यों लोभी लोग ऊंचा दहेज मांगते हैं?
कुछ कम पड़ जाए तो देते हैं यातनाएं
जाने कैसे छोटी सी उम्र में बूढ़ी हो जाती है लड़कियाँ।
मन ही मन चीखती हैं,लाखों सवाल करती हैं अपने आप से ।
पर.....
कोई नहीं ऐसा जो थोड़ा ठहरे और सुन ले तकलीफ उनकी।
हर कोई मंदिर जाता है और देवी से मांगता है आशीर्वाद।
वही घर लौटकर पत्नी को पीटता है माँ से झगड़ता है।
अरे....
भाई से जबान लड़ाती है, चुप कर!
बहुत मुंह चलाती है, चुप कर!
ज्यादा बोलने वाली लड़कियां, बिन ब्याही रह जाती हैं।
चुप कर!
क्यों पुरुषों के मुंह पर ताला कोई नहीं चाहता?
बेटी को ज़्यादा मत पढ़ाओ, बिगड़ जाएगी।
जब भी हक मांगे, तुरंत चुप करो, बिगड़ जाएगी।
जो कभी पढ़ी ना हो, अपने हक के लिए लड़ी ना हो,
ऐसी बहु लाओ जो अपमान के खड़ी ना हो।
मेरी मां ने जो सहा, क्यों मुझे भी वह सहना होगा?
क्या हर युग की स्त्री को शोषित ही रहना होगा?
सतयुग की अहिल्या, त्रेता की सीता और द्वापर की द्रौपदी,
क्यों हर युग की स्त्री प्रताड़ित है, केवल स्त्री होने के नाते?

हां! मैं स्त्री हूं, लेकिन मुझमें भी प्राण बसते हैं।
क्यों मुझे अपनी इच्छाओं का दमन करने की दी जाती है सलाह?
बाहर महिलाओं की हक की बात करने वाला हर एक आदमी,
अपने ही घर की स्त्रियों पर चिल्लाता है।
ये दोमुही सोच आखिर कब तक चलेगी?
बहुत हुआ, स्त्री अब और नहीं सहेगी!
बाहरी जिम्मेदारी का हवाला देकर मर्द घर के कामों से छूट जाते हैं।
लेकिन यह भी सच है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
माँ खुद ही अपने बेटों को सिखाती है, बहू को सिर पर मत चढ़ाओ।
उसकी ज्यादा बात मत मान जाना।
पहले कलम छीन कर छीन ली जाती है उससे बोलने की आजादी।
फिर छीन लेते हैं उसकी सोच।
मैंने तो सुना था कि हीरा कठोर होता है।
फिर मुझे हीरा हीरा कहकर क्यों कोमल बनाया गया?
क्यों नहीं दिया गया इतना अधिकार की अपनी ओर उठने वाली आंखें नोच सकूँ?
तोड़ सकूँ उन हाथों को जो गलत इरादे से बढ़ते हैं मेरी ओर।
कि चुन सकूँ अपना जीवनसाथी।
कि जी सकूँ जिंदगी अपनी शर्तों पर।
स्त्री महान होती है, त्याग की मूर्ति होती है।
यही पट्टी पढ़ाकर छीन लेता है समाज,
स्त्रियों से उनका सब कुछ।
आखिर यह कब तक चलेगा?
समाज में स्त्री को न्याय बोलो कब मिलेगा?

-0-

नारी

रूपा वर्मा
पूर्व छात्रा और WEBEL संकाय

नारी, इस शब्द को जिसने भी आंका है,
हमेशा कम ही आंका है।
भूल गए वो इन सब में,
कि इस शब्द का वजूद कितना है।
सृष्टि के सृजन से लेकर ,
हर एक रूप में नारी है।
कभी देखो , शक्ति बनकर
मां दुर्गा वो नजर आए ।
कभी देखो, उसे ललकार कर
तो मां काली का रूप दिखलाए।
कभी देखो, ममता के सागर के रूप में
मां बनकर वो प्यार लुटाए।।
यू तो जिंदगी के हर क्षण में , (२)
नारी अलग - अलग रूपों में हैं ।
और अपने हर रूप को पाकर
नारी सच में सम्पूर्ण हैं।। (२)
जो कहते है, नारी कर ही क्या सकती है, (२)
वो जाकर इतिहास के पन्ने पलटाओ।
जहां खुब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
जहां अस्तित्व की रक्षा के लिए, जोहर होने वाली रानी पद्मावती थी।।
नमन है हर एक नारी को,
जिसने भारत का इतिहास रचने में, अपना सर्वस्व दे डाला,
और खुद को पुरुष के बराबर का, अधिकार समाज में दिलवाया।
और पूरे विश्व में अपनी कामयाबी का परचम लहराया।।
मत समझो उसे पराया, (२)
जिसके वजह से मकान घर होता है,
सपने संजोकर उसे सच करने का अधिकार
आखिर नारी को भी होता हैं।। (२)

शहर की ओर

पिनाकी सिंह

लेक्चरर, हिन्दी विभाग

मेरा गांव
अब पहले जैसा नहीं रहा।
अब नहीं आती उसकी मिट्टी से
सौंधी सी महक।
कच्ची पगडंडियों ने
पक्की सड़क का चोला पहन लिया है!

खपरैल और फूस की छतें तो खोजने से भी नहीं मिलतीं।
घरों को बनाने संवारने का ठेका
ले लिया है शहरी कंपनियों ने।
छज्जे नहीं, अब तो
बनने लगी हैं बालकोनियां।
शहरी हवा ने यहां डेरा
जमा लिया है।

नहीं बैठता पल भर भी कोई
जलेसर काका के पास।
जिनके आंगन में
कभी ठेल-पेल सी मची रहती थी।

खेतों में अब फसलें नहीं उगती
हरे खेतों को निगल गया है फैक्ट्री का काला धुआं।
बैल भी अब नाद पर
मुंह लटकाए बैठे रहते हैं।
कोई नहीं सुन पाता
उनकी कराह!
ट्रैक्टर ने उनसे सारे अधिकार

छीन लिए हैं।

राहगीर प्यास से मर जाए या कि भूख से
नहीं पड़ता असर किसी पर
नहीं पड़ता असर
यदि समाप्त हो जाए
मानवता
नष्ट हो जाए प्रकृति
मैं
तुम
और सब!

-0-

आजकल की देशभक्ति

प्रिया कुमारी
विद्यार्थी, राष्ट्र विज्ञान विभाग

आज देशभर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी जगह मिठाइयां और भाषण दिए जा रहे हैं। घरों, स्कूलों, दफ्तरों व कॉलेजों में झंडे लगाए जा रहे हैं। इस दिन लोग मर मिटने, देशभक्ति की कसमें खा रहे हैं।आजकल नया दौर चला है। लोग अपनी देशभक्ति का ऐलान ट्विटर व्हाट्सएप्प जैसे माध्यमों द्वारा करते हैं।

मुझे यह दिन कुछ खास ही पसंद है। स्कूल में जाकर फूलों की मालाओं को पिरोकर चित्रों पर चढ़ाना, कार्यक्रम में आयोजित नृत्य व गीतों का आनंद लेना, परंतु अब यह दिन सिर्फ आजकल के युवाओं के लिए स्वयं दिखावे का प्रश्न बनकर रह गया है। जो भी हो मुझे इससे न्यूज़ पर परेड देखने और खासकर थल जल एवं वायु सेवा का प्रदर्शन वैसे में न्यूज़ की शौकीन नहीं थी और ना ही अखबार की। परंतु पापा के साथ न्यूज़ देख लेती थी। पापा मुझे स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर गीत सीखाते। हालांकि मैंने कभी स्कूल में प्रदर्शन नहीं किया। शायद मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। खैर जो भी हो पापा के साथ गीत गाना अच्छा लगता है। मुझे न्यूज़ देखने का शौक तो नहीं था। परंतु पापा के साथ कभी-कभी देख लेती। शाम के समय मैंने एक न्यूज़ देखा। जिसमें एक लड़का हाथ में चाकू लिए रास्ते के बीचो-बीच आता हुआ एक लड़की को मारने की कोशिश करता है। लड़की चिल्लाती है, जान बचाने की कोशिश करती है, फिर भी मारी जाती है। उस रास्ते पर कई दुकानें और लोग थे। यदि वे साहस करते तो लड़की बच सकती थी। उसे समय मेरे मन में प्रश्न उठा कि जो लोग मर मिटने और देशभक्ति की भावना का ऐलान करते-करते हैं, उन्हें उसे वक्त क्या हो गया था? क्या उनकी देशभक्ति बस आधुनिक यंत्रों तक और दिखावे तक ही सीमित है? उनको उनके साहस को क्या हो जाता है? क्यों वे अत्याचार होते हुए भी चुप रह जाते हैं? क्या बॉर्डर पर जाकर ही हम देशभक्ति कर सकते हैं? हम अपने देशभक्ति अच्छे नागरिक के कर्तव्य व नैतिकता के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं देशभक्ति के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती परंतु लेखकों द्वारा लिखी स्वतंत्रता सेनानियों सुधारकों आदि के कार्यों को कविता व कहानियों के माध्यम से जानने की कोशिश करती हूं। इतिहास में से मेरा थोड़ा गहरा लगाव है। जब गांधी जी ने

अपनी लाठी के बल पर अंग्रेजों को भगाया था। उन्होंने कभी भी सत्य और अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्रों ने हमें देशभक्ति की सच्ची प्रेरणा दी और दुश्मनों से लड़ गए। उन महान आत्माओं का भार यह इतिहास नहीं उठा सकेगा। सच्ची देशभक्ति तो देश की सच्ची सेवा है। हम अत्याचार धोखाधड़ी, चोरी, मार काट आदि को देखकर चुप रह जाते हैं। हमारी देशभक्ति आजकल एक मोबाइल की रिंगटोन सी हो गई है। जिसमें राष्ट्रगान बजता रहे, हम सुनते रहे और कुछ ना करें। रामनरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं -

"सुन वीरता हमारी काँप पर जाएँ दुष्ट सारे।
कोई न्याय न छोड़ें आतंक से हमारे।
जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में।
हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में।"

मुझे यकीन है आज भी देश की सेवा करने वाले लोग हैं, जो बिना डरे हिम्मत से अपने आप को देश के लिए समर्पित करते है।

-0-

Teacher

K.B.K. SIRISHA
Student, Computer Science Department

A teacher is like spring who nurtures new green sprouts,
Encourages and leads us whenever we have doubts.
A teacher is like Summer, Whoes sunny temperament,
Makes Studying arpleasure,
Preventing discontent.
A teacher is like fall,
with methouds crisp and clear,
Lessons of bright colour, And a happy atmosphere.
A teacher is like winter, while it is snowing outside,
Keeping Students comfortable,
As a warm and helpful guide.
Teacher you do all these things with a pleasant attitude",
You're a teacher for all seasons,
And you have my Gratitude!
"Time is more valuable than wealth we can get more wealth but cannot get more time. Hence value your time..."

-0-

My Girl

Saraswati Ghatak
Student, Computer Science Department

When I depressed, cool me down,
I have some people to push me down

Take a fly, Remove the past,
Turn the page
Take it at least

Comeback your zone,
Give it to your own

Life is short, so some become unknown,
Life become flop
Give it the top

Before having the best night ,
You are suffering from your big know
the light side until you know the light,
You have to be the powerful sunlight

Take a rest,
Give your best

Have your thing own,
You will shown.

Karma will pay back,
When no one in your back, You will know,
That you are princess in your own.

-0-

Aspiration

Shanghamitra Chandra
Student, English Department

The four walls always make me desire a room of one's own,
The second sex is stigmatized, sexualized, pawned.
Yet, she aspires, suffocates and struggles for dignity
Shatters the glass wall, walks the street, claiming identity.

She's Athena, Aphrodite, Venus and Medusa at once
The Top Girls are not Handmaids in every circumstance
They have aspired to improve, rebelled to prove
That politics, society, biology and history are of collapsing magnitude.

She ascertains her worth in conservatively masculine sectors
She is transcending records, taking pride in her adventures.
As a female, feminine and feminist she's a staunch believer
That her aspirations will outperform the reign of Imperator Caesar.

-0-

UNFINISHED

Shreya Das
Student, English Department

Runu is a seven-year-old girl living with her younger brother, her father who works at the local grocery store while her mother spends her days homemaking. In their bleak world, surrounded by four walls of their dilapidated home, inconsequential, lies a bed barely able to fit them all, with their unwholesome meals to satisfy them, yet they live contended.

However, Runu's world is inconspicuous yet is ever-widening- vast and vivid. Her brother keeps her feet to the ground, their games with pebbles, clay, and leaves. She holds his hand tightly while walking down the road to school, holds him close to her chest whenever he cries. Runu, has an inextricable faith and love for her family.

The affluent girl next door whose world is very different than Runu's tiny home. She sits on her swing hanging on their balcony, imbibing the morning sun, with a new Teddy bear which she pampers like a mother coddles her child. Its pretty white fur seems soft and warm, the big brown eyes, bright and lively, she tries so hard to hug it but her tiny hands find it difficult to engulf it.

Runu runs to her mother and describes the Teddy bear pictorially. She desires to have such a Teddy and tells her mother how she'll cuddle it. She has never been so fascinated by something that much. Her mother simpers and pulls out old pieces of clothes from their rustic steel trunk and her old tin box of sewing kit. She sits down at one corner and starts sewing up a Teddy bear by herself. Runu feels astonished by her mother's ignorance, it disturbs her, she flounces away to the other room and locks the door behind.

The overhead sun now tired and descending, dims itself out to the crimson sky. Today, the kitchen remains cold, Runu's brother fast asleep

from hunger pangs. It's been a while since she locked herself up in that room, Runu impatiently stands up and walks towards the little window that connects the rooms and peeks through it. The bright red bandhani saree stuffed with scrape pieces forms a bohemian yet lifelike face of a teddy. Her mother is meticulously turning her wish into a being, Runu's eyes glistens again.

She hears a knock at the front door, her father enters after a hard day at work. It is unusual for him to see his wife sitting with needles and threads instead of dishes and mats. He seems befuddled by her wife. With fists clenched, he irks and his face reeks of uncanny wrath. He throws the empty tiffin canister towards her, the one she packed for him in the morning. The sudden jolt of agony hits her, he strikes her again with rage and displeasure.

What's happening! Runu's eyes wide-open in disbelief. She could clearly see everything, but her feet seem to have frozen to the ground. The world seems to be fading away, almost imaginary. The door remains ajar and in the corner of the room lies her mother's unfinished Teddy bear.

আলপনা: ঋদ্ধিমা নায়ক
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

চীনের নারী

সুলেখা মুর্মু
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

নামহীন

অদ্রিকা কোনার
ছাত্রী, রসায়ন বিভাগ

CHINESE PRESENT PAINTINGS FOR SALE

পৌলোমী দাস
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

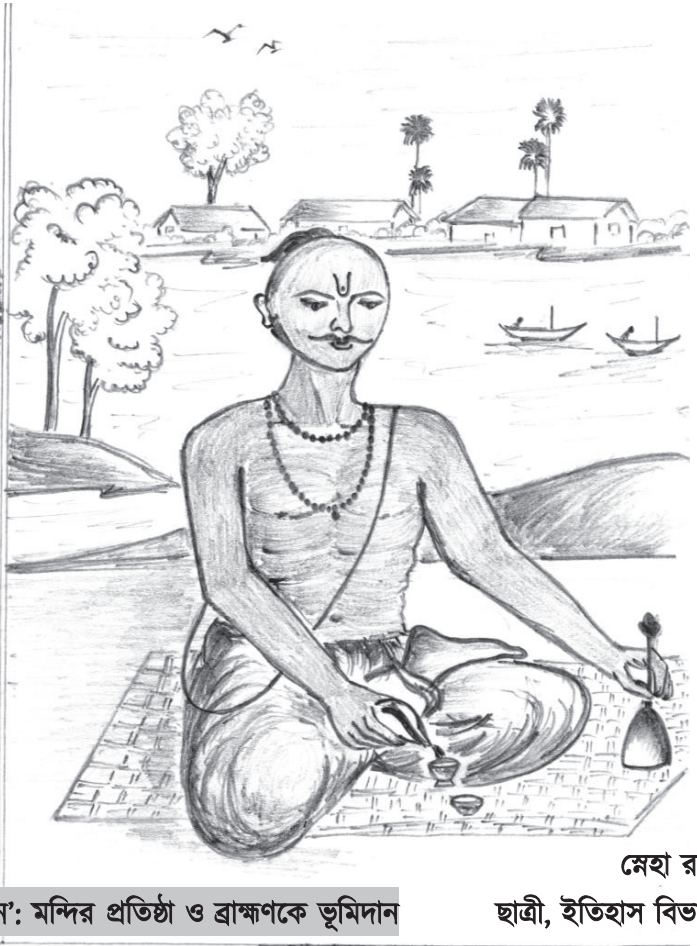

প্রাচীন ভারতে 'ভূমিদান': মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান

স্নেহা রায়
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ